দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতিক্রিয়া

"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কেন প্রয়োজন" প্রসঙ্গে

ড. ফজলুল হক সৈকত

গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত ড. তারেক শামসুর রেহমানের "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কেন প্রয়োজন" শীর্ষক লেখাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য এই মানুষটি একজন বিজ্ঞজন হিসেবে পরিচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিশেষ ভাবনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে তাঁর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত গবেষক একটি কলাম লেখা আমাদেরকে উপহার দেবেন বলে আমরা আশা করলেও এ ক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে নানাভাবে আশাহত করেছেন। তাঁর নিবন্ধে উপস্থাপিত ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য, স্ববিরোধী এবং অবমাননাকর বক্তব্য আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। নিবন্ধের প্রায় শুরুতে তিনি লিখেছেন- "শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি কমাতে হলে এখন থেকে কলেজগুলো সরিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (পূর্বের অবস্থায়) অধীনে দিতে হবে।" তাহলে তিনি কি মনে করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়? অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন- "গত ৫-৭ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় সার্টিফিকেট 'বিক্রির' প্রতিষ্ঠানরূপে।" আবার একবাক্য পরেই লিখছেন- "ক্যাডার হওয়া গত ষোল বছরে এক শ্রেণীর উপর সার্টিফিকেট 'বিক্রি' করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।" এ ধরনের তথ্য-পরিবেশন স্ববিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে আমরা মনে করি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত দুর্নীতির (প্রমাণিত নয়- এই অর্থে) কারণ, সময়কাল এবং সম্ভাব্য সংস্কার প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য স্ববিরোধী, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অস্পষ্ট। তিনি জানাচ্ছেন- "সাবেক এক উপাচার্যের আমলে (জোট সরকারের সময়ে) অনিয়ম হয়েছে সবচেয়ে বেশি।" একটু পরেই আবার লিখছেন- "অতীতে প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের সময়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম হয়েছে সবচেয়ে বেশি।" এরপর তাঁর অভিমত প্রকাশ করছেন এভাবে- "আমার অভিজ্ঞতা বলে একমাত্র রাজনৈতিক সরকারই পারে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে।" [illegible] যে আদৌ পরিকল্পিত পরিকল্পনার ধাপ রাখতে পারেননি, উপর্যুক্ত পরস্পর-বিরোধী ও অসংলগ্ন বাক্যই তার প্রমাণ বহন করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা-পদোন্নতি ও কাজ সম্পর্কে তিনি নানান ও অবাস্তব কথা বলেছেন। উক্ত প্রবন্ধে- "এখানে নিজস্ব প্রায় দু'শ" শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রভাষক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত। এই শিক্ষকরা কী কাজ করেন, তাদের গবেষণাকর্ম কী, তার হিসাব কেউ কোনদিন নেননি। তারা বিভিন্ন কমিটিতে থাকেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, মৌখিক পরীক্ষা নিতে যান- যান, তাদের দায়িত্ব শেষ। একজন শিক্ষকের কাজ কী এটাই? মঞ্জুরি কমিশনে থাকাকালীন সময়ে আমি পরামর্শ নিয়েছিলাম শিক্ষকদের বিভিন্ন কলেজে দিয়ে আসা- দিতে। কেননা প্রত্যন্ত অনেক কলেজেই অনার্স পড়ানোর মত শিক্ষক নেই। একজন সাবেক উপাচার্য উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেছিল। কেননা শিক্ষকদের অভিমত হচ্ছে তারা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক! তারা কেন কলেজে ক্লাস নেবেন? তারা ক্লাস নেননি। কিন্তু তারা ঠিকই 'প্রমোশন' নিয়েছেন- প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন, সহযোগী অধ্যাপক থেকে হয়েছেন অধ্যাপক। কিন্তু চাকরিকালীন সময়ে তিনি বা তারা কটি প্রকাশনা করেছেন, কটি বই লিখেছেন, কটি সেমিনার করেছেন- এ কথা কোন উপাচার্য কোনদিন বলেননি।"

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকৃত অর্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ৭৮ জন (একনো প্রায় চল্লিশ শতাংশ রয়েছেন শিক্ষাছুটিতে); একজনও অধ্যাপক নেই এবং প্রতিষ্ঠানটিতে এ পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের প্রমোশন হয়নি। আর শিক্ষকদের কাজ এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন বিষয়ক যে মত ড. তারেক প্রকাশ করেছেন, তা কল্পনাপ্রসূত এবং অবাস্তব; প্রায় সকল শিক্ষকই যে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা-প্রকাশনা-সেমিনার প্রভৃতির সাথে জড়িত আছেন, তা প্রাসঙ্গিক সামান্য খুঁজলেই জানতে পারতেন। আর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক সংকট নিরসনে তিনি যে উদ্যোগের কথা বলেছেন, তা রীতিমতো হাস্যকর! কেননা, অনার্স পর্যায়ে হাজার হাজার শূন্যপদে মাত্র দু'শ শিক্ষক (তাঁর হিসাব অনুযায়ী) দিয়ে সমস্যা সমাধানের চিন্তা বাতুলতা মাত্র! শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের অনুরোধ না জানিয়ে তিনি কেন এমন ধরনের অযৌক্তিক পরামর্শ দিয়েছিলেন (পরামর্শটি কি লিখিত ছিল, না-কি মৌখিক?; কলেজে পাঠদান কিংবা পাঠদান সহযোগিতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কী, তা কি তিনি জানেন?), তা-ও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ড. তারেক সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশ তা বাস্তবায়ন করতে দেবে না; তিনি তাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যও করেছেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তিনি লিখেছেন- "বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রয়েছেন, যারা কখনোই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে দেবে না। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা উপাচার্য মহোদয়দের বিভ্রান্ত করছে। উপাচার্য মহোদয়দের কখনোই তারা সৎ উপদেশ দেন না। অনেক সময় তারা উপাচার্যকে জিম্মি করে তাদের স্বার্থ আদায় করে নেন।"

তবে তাঁর রচনাটিতে দুটি বাস্তবসম্মত ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়- এক. "এমনিতেই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ছাত্রদের নিয়েই নানা সমস্যায় জর্জরিত। এখন আবার কলেজগুলোকে তাদের আওতায় দেয়া হলে তাতে প্রশাসনিক জটিলতা আরো বাড়বে। এটা ঠিক হবে না।"; দুই. "গাজীপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুন্দর। অবকাঠামোগত যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অথচ তা ব্যবহার করা হয় না। আমি এখানে পূর্ণাঙ্গ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। এখানে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি করার ও পাঠদান সম্ভব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মাধ্যমেই এটি করা যায়।" তাঁকে ধন্যবাদ এজন্য যে, নানান নেতিবাচক ধারণার মধ্যেও তিনি প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি- বিজ্ঞজন যদি ইতিবাচক মনোভঙ্গি নিয়ে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করেন, তাহলে দেশে একটি সুস্থিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি আদর্শ জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরিতেও তা হবে প্রবল সহায়ক। আর ড. তারেক শামসুর রেহমানরা অবশ্যই এ প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ ও প্রকাশমগ্ন হতে পারেন- এমন প্রত্যাশা নিশ্চয় অযৌক্তিক ও অন্যায় হবে না।

(লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও সাবেক সম্পাদক (২০০৫-০৬), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি)